[ তৃতীয় সংস্করণ ]

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকা

সিদ্ধেশ্বরীর দরিদ্র পিতামাতা এখনও বাঁচিয়া ছিলেন। বছর পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সংসার ফেলিয়া বেশী দিন সেথানে থাকিতে পারিলেন না, মাসথানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কাটোয়ার ম্যালেরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ী আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেমনি প্রাতঃস্নান করিতে লাগিলেন এবং কিছুতেই কুইনাইন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না; অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। দুই চারিদিন যায়—জ্বরে পড়েন, আবার ওঠেন, আবার পড়েন। ফলে, দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন,—এম্‌নি সময়ে শৈল বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি সুরু করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড় বধুর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিংবা আর কেহ তাহা পারিত না। আরো একটা কারণ ছিল। মনে মনে সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে ভারি ভয় করিতেন। শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ, এবং এম্‌নি কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার সুরু করিলে, তিন দিন কোন উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো যাইত না—এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার হেতু ছিল। শৈলর মাসীর বাড়ী পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া অবধি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর নিরামিশ রান্নার আবশ্যক নাই,—তাই

সকালেই সিদ্ধেশ্বরীর মেজ ছেলে হরিচরণের উপর তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার দিয়া, সে পটলডাঙ্গায় গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘণ্টা-দুই হইল, সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভাল করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টায় তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জ্জীবের মত তাঁহার অতি প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়া ছিলেন; এবং এই শয্যার উপরেই তিন-চারিটি ছেলে মেয়ে চেঁচাচেঁচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদীপের আলোকের সুমুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল—অর্থাৎ, বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োহুড়ি দেখিতেছিল। ওধারের শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিৎ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাশের পড়া তৈরি করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচা-চেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল, ইহারা সকলেই মেজকর্ত্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আমার ডান দিকে শোবার পালা, না বড়মা?

কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্ব্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল, না বিপিন, তুমি না। বড়মার ডান দিকে আমি শোব যে।

বিপিন প্রতিবাদ করিল, তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা?

কাল শুয়েছিলুম ? আচ্ছা, আজ তবে বাঁ দিকে।

যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুদ্র মস্তক লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল, সে এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁ-দিক ঘেঁসিয়া পড়িয়াছিল। বে-দখল হইবার সম্ভাবনায়, অমন হুড়োমুড়িতে পর্য্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে।

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, পটল ! বড় ভায়ের সঙ্গে তর্ক করোনা বল্‌চি ! মাকে বলে দেব।

পটল বেচারা অত্যন্ত বে-গতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, বড়মা, আমি কখন্ থেকে শুয়ে আছি যে।

কানাই ছোট ভায়ের স্পর্দ্ধায় চোখ পাকাইয়া "পটল" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দার এক প্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল, ওরে বাপ্‌রে ! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েচে !

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্ত্তন ! ও বিছানায় হরিচরণ পাঠ্যপুস্তকটা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া, এবার বোধ করি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল— চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁদিক ডানদিকের সমস্যায় আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল— 'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি,'—আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য ওই শিশুর

দলটি। ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে এক মুহূর্তে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এই মাত্র ফিরিয়া বড়জার জন্য এক বাটী গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাই-লালের 'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকের হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতি চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সে "আনন্দ-মঠ" পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ, জীবানন্দ ছোট-খুড়িমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না! এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওরে 'ওই বিস্তীর্ণ জলরাশি,' এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

কারণ ইহারাই তাহার বাঁদিক ডানদিকের মোকদ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিলেন, কাউকে ত দেখচিনে, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে।

এবারে কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত

বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, কেউ পালায়নি মা, সব ঐ নেপের মধ্যে ঢুকেচে। তাহার কথা ও মুখ চোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিলেন। দূর হইতে তিনি ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবার, বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিদি, খেয়ে ফেল্‌লে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধম্‌কাতেও কি পার না? ওরে, ওই সব ছেলেরা—বেরো—চল্‌ আমার সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন; এখন মৃদুকণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকেই বা খেয়ে ফেল্‌বে কেন আর, তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সামনে কাউকে তোর মার-ধর কত্তে হবে না। যা, তুই এখান থেকে—লেপের ভেতরে ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠ্‌চে।

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি কি শুধুই মার ধর করি দিদি?

বড্ড করিস্‌ শৈল! ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন, তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালীবর্ণ হয়ে যায়—আচ্ছা যা না বাপু, তুই সুমুখ থেকে; ওরা বেরুক্‌।

আমি ওদের নিয়ে যাব। অমন করে দিবা রাত্রি জ্বালাতন করলে তোমার অসুখ সারবে না। পটল সব চেয়ে শান্ত, সে শুধু তার বড়মার কাছে শুতে পাবে, আর সবাইকে আজ থেকে আমার কাছে শুতে হবে. বলিয়া শৈলজা জজ সাহেবের মত রায় দিয়া বড় জায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি এখন ওঠো—দুধ

খাও—হাঁরে হরি, সাড়ে ছ'টার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত? প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে সন্তানদিগের সঙ্গে এতক্ষণ বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, দেশ উদ্ধার করিতেছিল, তুচ্ছ ঔষধ পথ্যের কথা তাহার মনেও ছিল না। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ওষুধ টষুধ আর আমি খেতে পারব না শৈল!

তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চুপ কর, বলিয়া হরিচরণের বিছানার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, তোকে জিজ্ঞেস কচ্চি, ওষুধ দিয়েছিলি? তিনি ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই হরিচরণ জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, ভীত কণ্ঠে বলিল, মা খেতে চান্ না যে!

শৈলজা ধমক দিয়া উঠিলেন, ফের্ কথা কাটে। তুই দিয়েছিলি কি না, তাই বল্।

খুড়ির কঠোর শাসন হইতে ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কেন তুই এত রাত্তিরে হাঙ্গামা কত্তে এলি বল্ ত শৈল? ওরে ও হরিচরণ, দিয়ে যানা শীগ্‌গীর কি ওষুধ টষুধ আমাকে দিবি! হরিচরণ একটু সাহস পাইয়া ব্যস্তভাবে শয্যার অপর প্রান্তে নামিয়া পড়িল, এবং দেরাজের উপর হইতে একটা শিশি ও ছোট গেলাস হাতে করিয়া জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছিপি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই শৈলজা সেইখান হইতে বলিলেন, গেলাসে ওষুধ

ঢেলে দিলেই হ'ল, না রে হরি! জল চাইনে, মুখে দেবার কিছু চাইনে, না? এই ব্যাগার-ঠ্যালা কাজ তোমাদের আমি বার কচ্চি।

ঔষধের শিশিটা হাতে করিতে পাইয়া হরিচরণের হঠাৎ ভরসা হইয়াছিল, বোধ করি ফাঁড়াটা আজিকার মত কাটিয়া গেল। কিন্তু, এই 'মুখে দিবার কিছুর' প্রশ্নে তাহা উবিয়া গেল। সে নিরুপায়ের মত এদিকে ওদিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, কোথাও কিছু নেই যে খুড়ি মা!

না আন্‌লে কোথাও কিছু কি উড়ে আস্‌বে রে?

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, ও কোথায় কি পাবে, যে দেবে? এসব কি পুরুষমানুষের কাজ? শৈলর যত শাসন এই ছেলেদের ওপরে। নীলিকে বলে যেতে পারিস নি? সে মুখ-পোড়া মেয়ে তুই আসা পর্য্যন্ত এঘর একবার মাড়ায় না—একবার চেয়ে দেখে না, মা মরেছে কি বেঁচে আছে।

সে কি ছিল দিদি, সে আমার সঙ্গে পটলডাঙ্গায় গিয়েছিল যে।

কেন গেল? কোন্ হিসেবে তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি? দে, হরিচরণ তুই ওষুধ ঢেলে দে—আমি অমনি খাবো,—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনুপস্থিত কন্যার উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দিয়া ঔষধের জন্য হাত বাড়াইলেন।

একটু থাম্ হরি, আমি আন্‌চি, বলিয়া শৈল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

## ২

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বিদেশে থাকিয়া বেশ একটু সাহেবি আনা শিখিয়াছিলেন। ছেলেদের তিনি বিলাতি পোষাক ছাড়া বাহির হইতে দিতেন না। আজ সকালে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিকে বসিয়াছিলেন, কন্যা নীলাম্বরী ঔষধের তোড়-জোড় সুমুখে লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, দিদি, দরজি অতুলের কোট তৈরি করে এনেচে, কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে।

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, জামার দাম কুড়ি টাকা?

নয়নতারা একটু হাসিয়া বলিলেন, এ আর বেশী কি দিদি? আমার অতুলের এক-একটি সুট তৈরি করতে ৬০।৭০ টাকা লেগে গেছে।

'সুট' কথাটা সিদ্ধেশ্বরী বুঝিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বুঝাইয়া বলিলেন, কোট, প্যাণ্ট, নেকটাই—এই সব আমরা সুট বলি।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষুব্ধভাবে মেয়েকে বলিলেন, নীলা, তোর খুড়ি-মাকে ডেকে দে, টাকা বার করে দিয়ে যাক্।

নয়নতারা বলিলেন, চাবিটা দাও না—আমিই বার করে নিচ্ছি।

নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—সে-ই বলিল, মা কোথা পাবেন, লোয়ার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়িমার কাছে থাকে, বলিয়া চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিলেন, ছোট বৌ এতদিন ছিল না, তাই বুঝি দিনকতক সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে ছিল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক করিতে সুরু করিয়াছিলেন, জবাব দিলেন না।

মিনিট দশেক পরে টাকা বাহির করিয়া দিতে শৈলজা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন অতুলের নূতন কোট লইয়া রীতিমত আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। অতুল কোট্‌টা গায়ে দিয়া ইহার কাটছাঁট প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেছে এবং তাহার মা ও হরিচরণ মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া ফ্যাসান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে। অতুল বলিল, ছোট খুড়িমা, তুমি দেখ ত, কেমন তৈরি করেচে।

শৈল সংক্ষেপে, বেশ, বলিয়া সিন্দুক খুলিয়া কুড়িটা টাকা গণিয়া তাহার হাতে দিল।

নয়নতারা উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া, নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোর তোরঙ্গভরা পোষাক, তবু তোর আর কিছুতেই হয় না।

ছেলে অধীরভাবে জবাব দিল, কতবার বল্‌ব মা, তোমাকে? আজকালকার ফ্যাসান এই রকম কাট্‌-ছাঁট্‌, অন্ততঃ একটাও এ রকমের না থাক্‌লে লোক হাস্‌বে যে। বলিয়া টাকা লইয়া

বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া বলিল, আমাদের হরিদা যা গায়ে দিয়ে বাইরে যায়, দেখে আমারই লজ্জা করে। এখানে ঝুলে আছে, ওখানে কুঁচ্‌কে আছে—ছি ছি কি বিশ্রীই দেখায়! তারপর হাসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিল, ঠিক যেন একটি পাশবালিশ হেঁটে যাচ্চে!

ছেলের ভঙ্গি দেখিয়া নয়নতারা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; নীলা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতে লাগিল।

হরিচরণ করুণ চক্ষে ছোটখুড়ির মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

সিদ্ধেশ্বরী নামে মাত্র আহ্নিক করিতেছিলেন, ছেলের মুখ দেখিয়া ব্যথা পাইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, সত্যিই ত! ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই শৈল? দে না, বাছাদের সব দুটো জামাটামা তৈরি করিয়ে।

অতুল মুরুব্বির মত হাত নাড়িয়া বলিল, আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দরজিকে দিয়ে দস্তুরমত তৈরি করিয়ে দেব, —বাবা, আমাকে ফাঁকি দেবার জো নেই।

নয়নতারা পুত্রের হুঁসিয়ারি সম্বন্ধে কি একটা বলিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমাকে জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে। ওদের জামা তৈরি করবার লোক আছে। বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সক্রোধে বলিলেন, দিদি ছোটবো'র কথা শুন্‌লে ? কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি ?

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু শৈল শুনিতে পাইল। সে দু'পা পিছাইয়া আসিয়া মেজজায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোটবোর কথা দিদি অনেক শুনেচে,— তুমিই শোননি। অতুল ছোট ভাই হয়ে হরিকে যেমন ক'রে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হাস্‌লে,—ও আমার পেটের ছেলে হ'লে আজ ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌তুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘর শুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে নয়নতারা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বড়জা'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— দিদি, আজ আমার অতুলের জন্মবার, আর ছোট বৌ যা মুখে এল, তাই ব'লে তাকে গাল দিয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছোট দুই জায়ের কলহের সূচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন।

নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিলেন,—তুমি নিজে কিছু না ক'রে দিলে, আমাদের যাহোক্‌ একটা উপায় ক'রে নিতে হবে। তথাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। তখন নয়নতারা ছেলেকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু মিনিট দশেক পরে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক সারিয়া

গাত্রোত্থান করিতেই মেজবৌ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন মাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি মেজবৌ?

নয়নতারা কহিলেন, সেই কথাই জান্‌তে এসেছি। আমি কারু খাইনে পরিনে, দিদি, যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিনীত-ভাবে বলিলেন,—ঝাঁটা মার্‌বে কেন মেজবৌ, ওর ঐ রকম কথা। তা' ছাড়া তোমাকে ত বলেনি, শুধু—

শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁততে চেয়েছিল। আর আমি খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হাসি! শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি—আবার ঝ্যাঁটা লোকে কি ক'রে মারে? ধ'রে মারেনি ব'লে বুঝি তোমার মন ওঠেনি?

সিদ্ধেশ্বরী অবাক্‌ হইয়া গেলেন। আস্তে-আস্তে বলিলেন, ও কি কথা মেজবৌ? আমি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েচি?

মেজবৌ চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জ্বলিয়া মরিতে-ছিলেন, উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন, সে তুমিই জান। কেউ কারো মন জান্‌তে যায় না দিদি, চোখে দেখে, কানে শুনেই বল্‌তে হয়। আমরা নূতন লোক, তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপদবালাই হয়ে থাকি, বেশ ত, তুমি নিজে বল্‌লেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

এ অভিযোগের উত্তর সিদ্ধেশ্বরীর মুখে যোগাইল না, বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজবৌ অধিকতর কঠোর স্বরে কহিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় কর্‌লেই ত দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চ'লে যাই। উঃ—উনি শুন্‌লে একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌বেন। যা'কে তা'কে ব'লে বেড়ান, আমাদের বৌঠাকরুণ মানুষ নয়—সাক্ষাৎ ঠাকুরদেবতা!

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, এমন অপবাদ আমার শত্তুরেও দিতে পারে না মেজবৌ! এ সব কথা ঠাকুরপোকে শোনানোর চেয়ে আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেছ ব'লে আমার কত আহ্লাদ—আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটী দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আহ্নিক হয়েছে?—একটু দুধ খাও দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী কান্না ভুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, বেরো আমার সুমুখ থেকে—দূর হয়ে যা।

হঠাৎ শৈল থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোর যা মুখে আস্‌বে, তাই লোককে বল্‌বি কেন?

কা'কে কি বলেচি?

সিদ্ধেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেম্‌নি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে ব'লে-ব'লে তোর বুক বেড়ে গেছে

—কে তোর কথার ধার ধারে না? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস্? দূরহ' আমার সুমুখ থেকে।

শৈল সহজ ভাবে বলিল, আচ্ছা, দুধ খেয়ে নাও, আমি যাচ্চি। এ বাটিটায় আমার দরকার।

তাহার নিরুদ্বিগ্ন কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন, খাবো না, কিচ্ছু খাবো না, তুই যা। হয় তুই বাড়ী থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই—দুটোর একটা না ক'রে আমি জলস্পর্শ করব না।

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, আমি এই সে দিন এসেচি দিদি, এখন যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক কাটোয়ায় থাক গে—কাছেই গঙ্গা—অম্‌নি বার ক'রে নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছকথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় কচ্চ বল ত? জ্ব'রে জ্ব'রে দিদি আধমরা হয়ে রয়েছে, ওঁকে কেন বিধ্‌চ? আমি যদি দোষ ক'রে থাকি, আমাকে বল্‌লেই ত হয়—কি হয়েচে বল?

সিদ্ধেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আজ অতুলের জন্ম-দিন, কেন তুই বাছাকে অমন কথা বল্‌লি?

শৈল হাসিয়া উঠিল, ওঃ, এই? কিছু ভয় করো না মেজদি, —তোমার মত আমিও ত মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেম্‌নি। মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি। আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করচি,—নাও দিদি, খেয়ে নাও, আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কান্নার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আচ্ছা, তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান্, তুই তাকেও মন্দ বলেচিস্।

আচ্ছা, মান্‌চি বলিয়া শৈল তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাত দিয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া কহিল, যদি অন্যায় ক'রে থাকি মেজদি, মাপ কর—আমি ঘাট মান্‌চি।

নয়নতারা হাত বাড়াইয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া, চুম্বন করিয়া, মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সিদ্ধেশ্বরীর বুকের ভারি বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্নেহে, আনন্দে গলিয়া গিয়া নয়নতারার মত ছোট জায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া মেজজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ পাগ্‌লীর কথায় কোন দিন রাগ কোরো না মেজবৌ! এই আমাকেই দেখ না—ওকে বকি-ঝকি, কত গাল-মন্দ করি; কিন্তু একদণ্ড দেখ্‌তে না পেলে বুকের ভেতরে কি যেন আঁচড়াতে থাকে—এত দুধ ত খেতে পার্‌ব না দিদি?

পার্‌বে, খাও।

সিদ্ধেশ্বরী আর তর্ক না করিয়া জোর করিয়া সমস্তটা খাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, এক্ষণি বাছাকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করিস্ শৈল।

এক্ষণি কর্‌চি বলিয়া, শৈল হাসিয়া খালি বাটিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

অতুল এমন অপ্রস্তুত জীবনে হয় নাই। শৈশব হইতে আদর-যত্নে লালিত-পালিত; বাপ-মা কোন দিন তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে কথা কহিতেন না। আজ সকলের সম্মুখে এত বড় অপমান তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া নূতন কোটটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিল।

আজ হরিচরণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল অতুলের উপর। কারণ, তাহারই ওকালতি করিতে গিয়া সে লাঞ্ছিত হইয়াছে—তাই সেও তাহার পাশে আসিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিল। ইচ্ছাটা--তাহাকে সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু, সময়োপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু অতুলের আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। কারণ, অপমানটাই এ ক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাসান, অনেক কোটপ্যাণ্ট নেক্‌টাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, নানা রকমে অনেক উঁচুতে তুলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোট খুড়ীমার একটা তিরস্কারের ধাক্কায় অকস্মাৎ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যায় দেখিয়া, সে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিদা'কে উদ্দেশ করিয়া সরোষে বলিল, আমি কারো কথার ধার ধারিনে বাবা! এ অতুলচন্দর,—রেগে গেলে ও সব ছোট খুড়ী-টুড়ি কাউকে কেয়ার করে না!

হরিচরণ এদিকে-ওদিকে চাহিয়া ভয়ে-ভয়ে প্রত্যুত্তর করিল —আমিও করিনে—চুপ্, কানাই আস্‌চে। পাছে নির্ব্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে, এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মোগল বাদশার নকিবের মত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল, মেজদা, সেজদা' মা ডাক্‌চেন—শীগ্‌গির।

হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, আমাকে? আমি কি করেচি? আমাকে কখ্‌খন নয়—যাও অতুল, ছোট খুড়ীমা ডাক্‌চেন তোমাকে।

কানাই প্রভুত্বের স্বরে কহিল, দু'জনকেই—দু'জনকেই—এক্ষণি অ্যাঁ, সেজদা, তোমার নতুন কোট মাটীতে ফেলে দিলে কে? প্রত্যুত্তরে সেজদা শুধু মেজদা'র মুখের পানে চাহিল, এবং মেজদা'—সেজদা'র, মুখের পানে চাহিল। কেহই সাড়া দিল না। কানাই ভূলুণ্ঠিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি—তুমিই বলেচ, ছোট খুড়ীমাকে কেয়ার কর না—

আমি একা বলিনি, তুমিও বলেচ, বলিয়া অতুল সগর্ব্বে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। ভাব্‌টা এই যে, আবশ্যক হইলে সে সত্যকথা প্রকাশ করিয়া দিবে; হরিচরণের চেহারা আরও

খারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোট খুড়ীমা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা জানা নাই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে, তাহাও আন্দাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল, সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার নালিশের রীতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু, কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া ভরসা হইল না। এদিকে হাজিরির সময় নিকটতর হইয়া আসিতেছে—কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয় ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আত্মরক্ষার উপস্থিত আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া, বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশ্যে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোট খুড়ীমাকে বাড়ীশুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া সংবাদ লইয়া জানিল, ছোট খুড়ীমা নিরামিষ-রান্নাঘরে আছেন। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ বাটীর অন্যান্য ছেলেদের মত, সে এই ছোট খুড়ীমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকেও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে, ইহা সে জানিতই না। অথচ, সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত ও মৃদু আত্মীয়-আত্মীয়ার কাছে জন্মাবধি প্রশ্রয় পাইয়া পাইয়া, তাহার মা, খুড়ী, জ্যাঠাই প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইহাদিগের মুখের উপর শুধু কড়া জবাব দিতে পারিলেই কাজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরে প্রকাশ করিতে

পারা চাই। তাহা হইলেই ইহারা সায় দেন, অন্যথা দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে, তাহাকে চিরকাল ঠকিয়া মরিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সে হরিচরণের বেশ-ভূষার অভাব লক্ষ্য করিয়া, এই ফন্দিটা গোপনে তাহাকে শিখাইয়াও দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্র, নিজের বেলায় কোন ফন্দিই খাটে নাই, ছোট খুড়ীমার তাড়া খাইয়া কড়া জবাব ত ঢের দূরের কথা—কোন প্রকার জবাবই মুখে যোগায় নাই—হতবুদ্ধির মত নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিরিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিবার অভিপ্রায়ে সে অমন মরিয়ার মত রান্নাঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এমন কি, মুখ তুলিলেই তিনি অতুলকে দেখিতে পাইতেন; কিন্তু রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দও শুনিতে পাইলেন না, মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু অতুল খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল। নিমিষমাত্র, তথাপি সে অনুভব করিল, এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জ্যেঠাইমার নয়—এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহারই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিস্ফারিত বক্ষ আপনি কুঞ্চিত হইয়া গেল, এবং সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু পর্যন্ত সাহস হইল না—কোন রকম সাড়া দিয়াও ছোট খুড়ীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। •

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ সেজদা'র পায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঁড়াইল, এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ভীত ব্যাকুল ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জানাইতে লাগিল, জুতা পায় দিয়া দাঁড়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোট খুড়ীমার আনত মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল অন্তরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল, নিঃশব্দে সরিয়া যায়, একবার ভাবিল, জুতা-জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ছোট বোনের সুমুখে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থই জানিত না, এবং স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক তাহা অমান্যও করে নাই। কিন্তু পিতামাতার কাছে নিরন্তর অবারিত ও অসঙ্গত প্রশ্রয়ে তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত, বিবর্ণ মুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া নিজের সর্ব্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও সে অভিমানী দুর্য্যোধনের মত সূচ্যগ্র ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সস্নেহে মৃদু হাসিয়া বলিল, অতুল এসেচিস্? দাঁড়া বাবা—ও কি রে, জুতো পায়ে? নীচে যা —নীচে যা—

বাড়ীর আর কোনো ছেলে অনুরূপ অবস্থায় শৈলজার হাতে

এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত, কিন্তু অতুল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আস্‌তে নেই অতুল, নীচে যাও।

অতুল শুষ্কমুখে ক্ষীণস্বরে কহিল,—আমি ত চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—এখানে দোষ কি ?

শৈলজা ধম্‌কাইয়া উঠিল,—দোষ আছে যাও।

অতুল তথাপি নড়িল না ; সে মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে। তাই বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—আমরা চুঁচ্‌ড়ার বাড়ীতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রান্নাঘরে যেতুম—এখানে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ালে কিচ্ছু দোষ নেই।

ইহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া শৈলজা দুঃসহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে হরিচরণের বড় ভাই মণীন্দ্র ডম্বেল ও মুগুর ভাঁজিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বাহিরে যাইতেছিল। শৈলজার চোখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে খুড়ীমা ?

ক্রোধে শৈলজার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঁড়াইয়াছিল, অতুলের পায়ের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া

বলিল, সেজদা জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিছুতে নাবছে না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল,—এই—নেবে আয়।

অতুল গোঁ-ভরে বলিল,—এখানে দাঁড়াতে দোষ কি? ছোট খুড়ী আমাকে দেখ্‌তে পারে না ব'লে শুধু যা—যা কচ্চে।

মণীন্দ্র তড়াক্ করিয়া রকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অতুলের গণ্ডে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল,—'ছোটখুড়ী' নয়—'ছোট খুড়ীমা'; 'কচ্চে' নয়—'কচ্চেন' বল্‌তে হয়,—ইতর কোথাকার!

একে মণীন্দ্র পালোয়ান লোক, চড়ের ওজনটাও ঠিক রাখিতে পারে নাই, অতুল চোখে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

মণীন্দ্র ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল। এতটা আঘাত করা সে ইচ্ছাও করে নাই, আবশ্যকও মনে করে নাই। ব্যস্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতদুটা ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিবামাত্রই অতুল ক্রোধোন্মত্ত চিতা-বাঘের মত মণীন্দ্রের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া এমন সকল মিথ্যা সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যাহা হিন্দুসমাজে থাকিয়া, জাটতুত-খুড়তুত ভায়ের মধ্যে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মণি প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাসে পড়ে এবং বয়সে ছোট ভাইদের চেয়ে অনেকটাই বড়। তাহারা বড় ভায়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া কথা কহিতে

পারে না। এ বাড়ীতে ইহাই সে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে। কেহ যে এই সমস্ত অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না—অতুলের ঘাড় ধরিয়া সজোরে তাহাকে সানের উপর নিক্ষেপ করিয়া, লাথি মারিয়া মারিয়া ঠেলিয়া উপর হইতে প্রাঙ্গণের উপর ফেলিয়া দিল। কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বৈ রৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মা সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, মেজবধূ নির্জ্জনে ঘরে বসিয়া গোটাদুই সন্দেশ গালে দিয়া জল খাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন—গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে নীলবর্ণ হইয়া গেলেন। মুখের সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া, মড়াকান্না তুলিয়া, ঝাঁপাইয়া আসিয়া ছেলের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। সমস্তটা মিলিয়া এম্‌নি একটা গণ্ডগোল উঠিল যে, বাহির হইতে কর্ত্তারা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলজা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল,—'মণি, তুই বাইরে যা।' বলিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিলেন। মণি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তাহার পিতা মেজ বউমার উন্মাদ ভঙ্গী দেখিয়া, লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মহামারি ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে, হরিশ ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন। অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে ছোট খুড়ীর প্রতি সমস্ত দোষারোপ করিয়া কহিল, ও বড়দা'কে মার্‌তে শিখিয়ে দিলে—ইত্যাদি ইত্যাদি। হরিশ চীৎকার করিয়া

বলিলেন, ছোট বৌমা, মণিকে যে তুমি খুন করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি?

নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে ছোট খুড়ার হইয়া জবাব দিল—সেজদা' কথা শোনেন নি, আর বড়দা'কে গালাগালি দিয়েচেন, তাই।

নয়নতারা ছেলের তরফ হইতে বলিলেন,—তবে আমিও বলি ছোটবৌ—তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেল্‌ছিল বলেই প্রাণের দায়ে ও গাল দিয়েচে, নইলে গাল দেবার ছেলে ত আমার অতুল নয়।

নয়ই ত! বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও ক্রুদ্ধস্বরে জানিতে চাহিলেন—তোর ছোটখুড়ীকে জিজ্ঞাসা কর্ নীলা, উনি কে, যে অতুলকে মারতে হুকুম দেন? কথা যখন ও না শুনেছিল, তখন কেন আমাদের কাছে নালিশ না করা হ'ল? আমরা উপস্থিত থাক্‌তে উনি শাসন করতে গেলেন কেন?

নীলা এই তিন তিন্‌টা প্রশ্নের একটারও উত্তর দিল না। সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়িত দেহে এই উত্তেজনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল। একে ত, এ সংসারে তিনি ছেলে-পিলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না, কারণ, তাঁহার মনে-মনে বিশ্বাস ছিল, ভগবান এ বাটীর সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই, অথচ শৈলকে সকলের ছোট

এবং ছোট বৌ করিয়াও রাশি প্রমাণ বুদ্ধি দিয়াছেন। হিসাব করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে কথাবার্ত্তা কহিতে, রোগে শোকে চারিদিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন করিতে, রাঁধিতে বাড়িতে, সাজাইতে, গুছাইতে, ইহার জুড়ি নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত। সেই শৈলকে যখন মেজকর্ত্তা কটূক্তি করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ বোধ করি, ভগবান্ তাঁহার মাথার মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন। সিদ্ধেশ্বরী একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন—বেশ ত মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না ক'রে নিজে শাসন করছ কেন? মা বেঁচে, আমি বেঁচে—ঝি বৌকে শাসন করতে হয়, আমরা কোর্ব্ব। তুমি পুরুষমানুষ, ভাসুর,—ও কি কথা—বাইরে যাও। লোকে শুনলে বলবে কি!

হরিশ লজ্জা পাইয়া বলিলেন—তুমি সব দিকে দৃষ্টি রাখলে ভাবনা কি বৌঠাকরুণ! তা হ'লে কি একজন আর একজনকে বাড়ীর মধ্যে হত্যা ক'রে ফেলতে পারে? বলিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই, তাঁহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন—

—বেশ ত, দাঁড়িয়ে দেখই না, উনি ঝিবৌকে কেমন শাসন করেন।

হরিশ সে কথার আর জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

৪

দিন-পাঁচেক পরে সকাল হইতেই মেজগিন্নীদের জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিনিট খানেক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ এ সব কি হচ্ছে মেজবৌ?

নয়নতারা উদাসভাবে জবাব দিলেন—দেখ্‌তেই ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি। কোথায় যাওয়া হবে?

নয়নতারা তেম্‌নিভাবে কহিলেন—যেখানে হোক্।

তবু, কোথায় শুনি?

কি ক'রে জান্‌ব দিদি, কোথায়? উনি বাসা ঠিক ক'র্‌তে বেরিয়েচেন, ফিরে না এলে ত বল্‌তে পারিনে।

তোমার ভাশুর শুনেচেন?

তাঁকে শুনিয়ে কি হবে? যাঁর শোনা দরকার, সেই ছোট-গিন্নী শুনেচেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।

এটা নয়নতারার মিছে কথা। শৈলজার এই সকাল-বেলাটায় নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না—সে কিছুই জানিত না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দেখ মেজবৌ, এই ভাশুরের মান-মর্য্যাদা তোমরা বুঝ্‌লে না; কিন্তু, বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লে শুন্‌তে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাশুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।

নয়নতারা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, আমরা

সে কথা কি জানিনে দিদি? দুজনে দিবারাত্রির বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড়জা মেলে। তোমার বাড়ীতে আমরা ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে চাকরের মত থাক্‌তে পারি; কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও বাস করতে পার্‌ব না।

আজ নয়নতারার কণ্ঠস্বরে এমন একটু আন্তরিকতার আভাস সিদ্ধেশ্বরীর কানে বাজিল যে, তিনি আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, এ আমার বাড়ী ত নয়, মেজবৌ, বাড়ী তোমাদেরই। কোন মতেই তোমাদের আমি আর কোথাও যেতে দিতে পার্‌ব না।

নয়নতারা ঘাড় নাড়িয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন—যদি কখন ভগবান্ তেমন দিন দেন দিদি, তা হ'লে তোমার কাছে এসেই আমরা থাক্‌ব; কিন্তু, এখানে একটি দিনও আর থাক্‌তে বোল না দিদি। আমার অতুল হয়েচে সকলের চক্ষুশূল; অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা স'রে যাই।

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, সে কি কথা মেজবৌ? দৈবাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে ব'লে কি সেই কথা মনে রাখ্‌তে আছে? অতুল আমাদের ছেলে—

কথাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন—কোন কথা মনে রাখ্‌তে পারিনে ব'লে কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি। ঐ যখন হ'ল, তখনই হাউমাউ ক'রে কেঁদে-কেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল—একটি কথাও আমার স্মরণ থাকে না।

আমি ত সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম ; কিন্তু,—রাগ কর্‌তে পাবে না দিদি,—তুমি যতই বল' আমাদের ছোটবৌ সহজ মেয়ে নয়। বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চুণ ক'রে বেড়ায় দেখেই ত জিজ্ঞেসা ক'রে শুন্‌তে পেলুম। না দিদি, এখানে আমাদের থাকা চল্‌বে না। এক বাড়ীতে থেকে ছেলে আমার অমন মনগুম্‌রে-গুম্‌রে বেড়ালে ব্যামোতে পড়্‌বে। তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়ায়, আমিও দুটো নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। বলিয়া ছেলের দুঃখে নয়নতারার চোখ দিয়া যে দু'ফাঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল। কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। আঁচল দিয়া মেজবৌর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে এতবড় কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে থাকিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারিতেন না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাছা রে! বাড়ীতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, মেজ'বৌ?

নয়নতারাও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জিজ্ঞেস ক'রেই দেখ না দিদি।

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন। হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—ও ছোট-লোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা?

বড়দা'কে যা মুখে আসে, তাই বলে; ছোটখুড়ীমাকে গালাগালি দেয়!

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, যা হয়ে গেছে, তার আর উপায় কি হরি; যা, ডেকে কথা কও গে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল,—ওর কথা বল্‌বার ভাবনা নেই, মা! পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে, সেই-খানে যাক্, ঢের বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মুখও ত নেহাৎ কম নয়, হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস্? আচ্ছা, সেই ভাল; আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা কর্‌তে যাব। ওঠো দিদি, জিনিসপত্রগুলো চাকরটা বেঁধে-ছেঁদে নিক্।

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মলবে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা কব। তা নইলে ছোটখুড়ীমা—না, মা, সে আমরা কেউ পার্‌ব না।

বলিয়াই আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মেজ-বৌ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু ছোটবৌ একবার যদি ছেলেদের ডেকে ব'লে দেয়, তা হ'লে সমস্ত গোলই মিটে যায়।

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা যায়।

মেজবৌ কহিলেন, তবেই দেখ দিদি। এই সব ছেলেরা বড় হ'য় তোমাকে মান্‌বে, না, ভালবাস্‌বে? বলা যায় না ভবিষ্যতের কথা—নিজের ছেলে-মেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্চে, কিন্তু আমার অতুল-টতুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অন্ত প্রাণ। আমি বল্‌লে, সাধ্যি কি তার এমন করে ঘাড় নেড়ে তেজ করে, বেরিয়ে যায়! এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই; নিরীহভাবে জবাব দিলেন—তা বটে। এ বাড়ীর মণি থেকে পটল পর্য্যন্ত সবাই ঐ শৈলর বসে। সে যা বল্‌বে, যা করবে, তাই হবে—কেউ আমাকে মানেও না।

এটা কি ভাল?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্‌টা? ওরে ও নীলা, তোর খুড়িমাকে একবার ডেকে দে ত মা।

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল। নয়নতারা আর কথা কহিলেন না, সিদ্ধেশ্বরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, জিনিসপত্তর বাঁধা হয়েছে—এরা তবে চ'লে যাক্‌?

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বই কি—কি পাষাণ প্রাণ তোর শৈল! তোর হুকুমে কেউ অতুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথা-

বার্ত্তা পর্য্যন্ত কয় না—কি ক'রে বাছার দিন কাটে, শুনি? আর নিজের ছেলের দিবারাত্র শুক্‌নো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন ক'রে এখানে বাস করে? তুই এদের তা হ'লে এ বাড়ীতে রাখ্‌তে চাস্‌নে বল্‌?

নয়নতারা চিম্‌টি কাটিয়া কহিলেন—তা হ'লে হয় ত সব দিকেই ছোটবৌর হয় ভাল।

শৈলজা এ কথা কানেও তুলিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে কহিল, অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ীর কোন ছেলেকেই মিশ্‌তে দিতে পারিনে দিদি। ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা মুখে বলা যায় না।

নয়নতারা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত মাথা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—হতভাগী, মায়ের মুখের সাম্‌নে তুই অমন ক'রে ছেলের নিন্দে করিস্‌! দূর হ আমার ঘর থেকে। মুখ যেন তোর খোসে যায়।

আমি ইচ্ছে ক'রে কখনো তোমার ঘর মাড়াইনে, মেজদি। কিন্তু তুমি এম্‌নি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে ব'সে আছ। বলিয়া শৈল শান্তভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা স'রে যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন ক'রে আমাদের টেনে

বেড়াচ্চ; কিন্তু, ছোটবো'র এতটুকু ইচ্ছে নয়—আমরা এ বাড়ীতে থাকি।

সিদ্ধেশ্বরী এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ওরা যা বল্‌চে, অতুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি, মেজবৌ।

আমি কি বল্‌চি—সে ভাল কাজ করেচে, দিদি? জ্ঞান-বুদ্ধি থাক্‌লে কেউ কি বড় ভাইকে গালাগালি দেয়! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায়ে নাকখত দিচ্চি, বলিয়া নয়নতারা মাটীতে সজোরে নাক ঘসিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—তাকে তোমরা মাপ কর দিদি, তার মুখ দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে—বলিয়া নয়নতারা আর একবার বোধ করি মাটীতে নাক ঘসিতে যাইতেছিলেন—সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনেক বলিয়া কহিয়া, অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মনের কথা খুলেই বল্ না শৈল, মেজবৌরা চ'লে যাক্।

প্রত্যুত্তরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাহনি সিদ্ধেশ্বরীকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া দিল,—বলিলেন, আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখে চূণকালী দিক্। আমার সংসারে বনিয়ে না চল্‌তে পার, যেখানে সুবিধে হয়, সেইখানে

তোমরা চ'লে যাও—আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা ত বাপু আমার বেশী আপনার নও। বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ করি, তাঁহার মনে মনে আশা ছিল, এইবার শৈলজা নরম হইয়া আসিবে। কিন্তু সে যখন একটা কথারও জবাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজের মনে হাতা-বেড়ী নাড়িয়া-চাড়িয়া রান্না করিতেই লাগিল, তখন তিনি যথার্থই মহাক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা বড়কর্ত্তা আহারে বসিলে, সিদ্ধেশ্বরী পাখার বাতাস করিতে করিতে দুঃখে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া সেই কথাই তুলিলেন; কহিলেন, মেজবৌদের আর ত এ বাড়ীতে থাকা পোষায় না দেখ্‌ছি। আজ সকাল থেকেই তাদের জিনিস পত্র বাঁধাবাঁধি হচ্চে!

গিরীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বই কি। এমনি ত ছোটবোয়ের সঙ্গে তিলার্দ্ধ বনে না, তার ওপর ছোটবৌ বাড়ীর সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ অতুলের সঙ্গে কথা কয় না। সে বেচারা এই ক' দিনে শুকিয়ে যেন অর্দ্ধেক হয়ে গেছে—

এই সময়ে শৈলজা দুধের বাটী হাতে দোর গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কাপড় চোপড় আর একবার ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাতের কাছে বাটী রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, এই যে ছোটবৌ—

বলিয়াই লক্ষ্য করিলেন, শৈল নিজের নাম শুনিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। ও-পক্ষের দোষ যতই হোক, অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোন মতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগ মানিতেছে না, দেখিয়া তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতেই তিনি কোমর বাঁধিয়াছিলেন, বলিলেন, এই যে শৈল এখন থেকেই ভায়ে ভায়ে অসদ্ভাব করে দিচ্চে, বড় হ'লে এরা ত লাঠালাঠি মারামারি ক'রে বেড়াবে—এটা কি ভাল?

কর্ত্তা ভাতের গ্রাস মুখে পূরিয়া বলিলেন, বড় খারাপ।

সিদ্ধেশ্বরী কহিতে লাগিলেন, ওর জন্যেই ত মণি অতুলকে অমন করে ঠ্যাঙালে। আচ্ছা সে-ও মেরেচে ও-ও গাল দিয়েচে—চুকে-বুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ ক'রে দেওয়া! আজ তুমি মণি-হরিকে ডেকে বলে দিয়ো—তারা অতুলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে, নইলে, ওরা চ'লে গেলে যে পাড়ার লোকে আমাদের মুখে চূণকালি দেবে। সত্যিই ত আর ছোট বৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়্‌তে পার্‌বে না।

তা ত নয়ই, বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, ছোট্‌ঠাকুরপো কি কোন দিন কিছু রোজগার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে না? এম্‌নি করেই কি চিরটা কাল কাটাবে?

স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া দ্রুতপদে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কর্ত্তা কি জবাব দিলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এই সকল প্রসঙ্গ সে কোন দিন শুনিত না ; এবং শুনিতে ইচ্ছাও করিত না। কারণ, তাহার মনে মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাহার স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অথচ সত্যকে সে আজীবন ভালবাসিত। তাহা প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয়ই হোক, বলিতে বা শুনিতে কোন দিনই মুখ ফিরাইত না। কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া যে সে তাহার এই স্বভাবটিকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল, তাহা বলা সুকঠিন।

৫

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধের উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে সুরু করুন, শৈলকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল—কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল ; স্বামী লইয়া খোঁটা দিলে শৈলর দুঃখ এবং অভিমানের অবধি থাকিত না, তাহা তিনি জানিতেন।

স্ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া, কর্ত্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন ; এবং কহিলেন, আমি বেশ ক'রে ধম্‌কে দেব'খন। বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চর্ব্বণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বস্তুতঃ, গিরীশের স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত

মোকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে,—কে যাইতেছে, কি খরচ হইতেছে। ছেলেরা কি করিতেছে, কিছুই তিনি তত্ত্ব লইতেন না। টাকা রোজগার করিতেন, এবং ভালমন্দ সব কথাতেই সায় দিয়া, যা হোক্ একটা মতামত প্রকাশ করিয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

সুতরাং 'ধম্‌কে দেব'খন' বলিয়া কর্ত্তা যখন কর্ত্তার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না; কাহাকে ধম্‌কাইবেন—কেন ধম্‌কাইবেন—জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি-পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল; ভাশুর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্থান করিল। কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল. অমন ক'রে ব'সে কেন দিদি—বেলা হ'ল, যাহোক্ চাট্টি দেবে চল।

সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, বেলা আর কোথায়—এই ত সবে এগারোটা।

এগারোটাই কি সোজা বেলা, দিদি? তোমার এই অসুখ শরীরে যে বেলা ন'টার মধ্যেই খাওয়া দরকার।

সিদ্ধেশ্বরীর এখন খাওয়া-দাওয়া কথাবার্ত্তা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিলেন, তা হোক, মেজবৌ; আমি কোন দিনই এত শীগ্‌গীর খাইনে—আমার একটু দেরি আছে।

নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া দিয়া কহিল, এই জন্যেই ত পিত্তি-পড়ে দেহের এই আকার। আমার হাতে হেঁসেল থাক্‌লে আমি ন'টা পেরুতে দিই ? তুমি না বাঁচ্‌লে কার আর কি দিদি, আমাদের সর্ব্বনাশ। নাও চলো, যা হোক্ দুটো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।

নয়নতারা একমাসের অধিককাল এখানে আসিয়াছে ; এবং বড়জায়ের জন্য প্রত্যহ এই দারুণ অস্থিরতা ভোগ করা সত্ত্বেও কেন যে এতদিন নিজেকে সুস্থির করিবার চেষ্টা করে নাই, সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে তাহার কারণ বুঝিলেন। কিন্তু কৈতব-বাদের এম্‌নি মহিমা, সমস্ত বুঝিয়াও, আর্দ্রচিত্তে কহিলেন, তুমি আপনার জন বলেই এ কথাটি আজ বল্‌লে, মেজবৌ ; নইলে, কে আর আমার আছে বল।

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রান্নাঘরে লইয়া গেল. এবং নিজের হাতে ঠাঁই করিয়া, পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুনঠাকুরুণের দ্বারা ভাত বাড়াইয়া, আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ-দিকের রান্না শৈলজা রাঁধিত ; মেজবৌ নীলাকে ডাকিয়া কহিল, তোর ছোটখুড়িকে বল্ গে, ও হেঁসেলে কি আছে, এনে দিতে।

মিনিটখানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছিল,—

তিনি মেজজা'কে লক্ষ্য করিয়া রোগীর কণ্ঠে চিঁচিঁ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা এই সঙ্গে কেন বস্‌লে না, মেজবৌ ?

মেজবৌ কহিল, আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি। তুমি খেয়ে ওঠো, আমি তোমার পাতেই বস্‌ব। শৈলজার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, না, দিদি; আমি বেঁচে থাক্‌তে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমাকে পালাতে দেব না, তা ব'লে দিচ্চি। একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবৌ কতদূরে আছে দেখিয়া লইয়া, কহিল, এঁরা দু'জনে যেমন সহোদর, আমরাও ত তেমনি দুটি বোন্। যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমার জন্যে কেঁদে মর্‌ব, আর কি কেউ তেমন ক'রে কাঁদ্‌বে ? অপরে করবে নিজের ভালোর জন্যে, কিন্তু আমি কর্‌ব ভেতর থেকে। তুমি এই যে বল্‌লে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ সত্যিকার আপনার জন নেই—এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেও না।

সিদ্ধেশ্বরী বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন—এ কি ভোল্‌বার কথা, মেজবৌ ? এতদিন যে তোমাকে চিন্‌তে পারিনি, তার শাস্তিই ত ভগবান্ আমাকে দিচ্চেন।

মেজবৌ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কহিল,—শাস্তি যা কিছু ভগবান্ যেন আমাকেই দেন, দিদি। সমস্ত দোষ আমার, আমিই তোমাকে চিনিনি। একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিল —আজ যদি বা জান্‌তে পেলুম, আমরা তোমার পায়ের ধূলোর

যোগ্য নই, কিন্তু, জানাবো সে কথা কি ক'রে দিদি ? তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা কর্‌ব, ভগবান্ সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমরা হয়েছি যে ছোটবোর দু'চক্ষের বিষ।

সিদ্ধেশ্বরী উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা হ'লে সে যেন তার ছেলেপিলে নিয়ে দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাতগুষ্ঠীকে দুধেভাতে খাওয়াবো কি নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্যে ? খুড়তুত ভাই, ভাজ, তাদের ছেলেপুলে—এই ত সম্পর্ক ? ঢের খাইয়েছি, ঢের পরিয়েছি—আর না। দাসী-চাকরের মত মুখ-বুজে আমার সংসারে থাক্‌তে পারে, থাক্, না হয় চলে যাক্।

অদূরে চৌকাঠ ধরিয়া শৈল যে দাঁড়াইয়া ছিল, সিদ্ধেশ্বরী তাহা স্বপ্নেও মনে করেন নাই। হঠাৎ তাহার আঁচলের চওড়া লাল পাড়টা প্রদীপ্ত অগ্নিরেখার মত সিদ্ধেশ্বরীর চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিতেই, তিনি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন ঠিক পাশের ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাঁহার আহারে রুচি চলিয়া গেল ; এবং এই মেজবৌকে তাহার সমস্ত আত্মীয়তার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই যেন এ-যাত্রা রক্ষা পান—তাঁহার এমনি মনে হইল।

মেজবৌ মহা উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, ও কি দিদি, শুধু ভাত নাড়্‌চ—খাচ্চ না যে ?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধস্বরে শুধু বলিলেন, না।

মেজবৌ কহিল, আমার মাথা খাও, দিদি, আর দুটি খাও— তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন কেন মিছে কতকগুলো বক্‌চ মেজবৌ, আমি খাবো না—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে, বলিয়া সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহ্বল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া সে তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীত-কণ্ঠে কহিল, না জেনে অন্যায় যদি কিছু ব'লে থাকি, দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস ক'রে থাক্‌লে, আমি সত্যি বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া, যা পারিলেন, নীরবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু, নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি করিয়া? এবং ইহার অনিবার্য্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাহার সেই অতি কঠোর উপবাস সুরু করিয়া দিবে, ইহাতেও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং দুপুরবেলা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, খুড়িমা ভাত খাইতে বসিয়াছেন,

তখন তাঁহার আহ্লাদ কতটুকু হইল, বলা যায় না, কিন্তু বিস্ময়ের আর তাঁহার অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাৎ এমন শান্ত এবং ক্ষমাশীল হইয়া উঠিল, তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে, ম্লানমুখে বসিয়া ছিলেন—আজ তাঁহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হউক, রমেশকে বকিতে হইবে —তাহা মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নীলা দাঁড়াইয়া ছিল,—তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, তোর ছোট কাকাকে ডেকে আন্, নীলা।

সিদ্ধেশ্বরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, তাকে আবার কেন?

কেন? তাকে রীতিমত ধম্‌কে দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।

হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, অলস মস্তিষ্ক সয়তানের কারখানা।

সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, না—না, বৌঠান, তুমি তাকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না—সে আর ছেলেমানুষটি নয়।

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিল না, রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল,—দাদার আহ্বানে ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি

চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, অতুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেছিস্ কেন ?

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ঝগড়া করেছি ?

গিরীশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আল্‌বাৎ করেছিস্। বলিয়া গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ঝড় গিন্নী বলছিলেন, তুই যা মুখে আসে, তাই বলে তাকে গালমন্দ করেছিস্। ও কি আমাকে মিথ্যা-কথা বল্‌লে ?

রমেশ অবাক্ হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন--তোমার কি ভীমরতি ধরেছে ? কখন্ তোমাকে বল্‌লুম.ছোট ঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেছে ?

হরিশ ভ্রম সংশোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না—না, সে ছোট বৌমা।

তখন গিরীশ বলিল, ছোট বৌমাই বা কেন গালমন্দ কর্‌বেন শুনি ?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, সে ই বা কেন অতুলকে গালমন্দ কর্‌বে ! সে-ও করেনি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বল্‌ব আমি। তুমি ছোট ঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্চ কেন ?

গিরীশ কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'ল ; কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে, খড়ের দালালি ক'রে আমার চার-চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি, আর দেখ্‌গে যা বাগবাজারের খাঁদের। এই খড়ের দালালিতে ক্রোরপতি হয়ে গেল।

হরিশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, খড়ের দালালি?

রমেশ কহিল, আজ্ঞে না, পাটের।

গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, তারা আমার মক্কেল—আমি জানিনে, তুই জানিস্? খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে জাহাজ-জাহাজ খড় পাঠাচ্ছে।

হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় পাটই হ'ল। এই পাটের দালালি ক'রে তুই কি দু'শ একশ'ও ক'রে আন্‌তে পারিস্ নে? তোমাদের আমি ত চিরকালটা বসে-বসে খাওয়াতে পার্‌ব না। 'যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধ'রে।' একবার চার হাজার গেছে—গেছেই। কুছ পরওয়া নেই—আবার চার হাজার দাও। না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা ব'লে, আমি খেটে মরব, আর তুমি ব'সে ব'সে খাবে?

হরিশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সব কাজ শিখ্‌তে হয়; নইলে, পাটের দালালি ত কর্‌লেই হয় না। বার বার এত টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়।

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, নয়ই ত। আমি পাটের দালালি-টালালি বুঝিনে তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে সুরু কর্‌তে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিন্‌বে, চার হাজার টাকা জমা থাক্‌বে। এটা নষ্ট হ'লে তবে ও টাকায়

হাত দেবে,—তার আগে নয়। বুঝ্লে? আমি তোমাদের ব'সে ব'সে খাওয়াতে পার্‌ব না—যাও।

রমেশ নীরবে চলিয়া গেলে, হরিশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই আট আট হাজার টাকাই জলে গেল, ধ'রে রাখুন। কি বল বৌঠান?

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন না কি?

গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যি কি রকম?

হরিশ বলিল, এই সে দিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার আট হাজার সেই জলেই ফেল্‌তে দেবেন, এ যেন আমি ভাব্‌তেই পারিনে।

গিরীশ কহিলেন, তা হলে তুমি কি রকম কর্‌তে বল?

হরিশ বলিলেন, রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি, দাদা? আট-হাজারই দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বে না—আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি। এই টাকাটা উপার্জ্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি।

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, ঠিক ঠিক; ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত। ও কি আবার একটা মানুষ?

হরিশ উৎসাহ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, তার চেয়ে বরং

একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা, তার তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আমাকে মাসে মাসে ২৫৲ টাকা মাষ্টারকে দিতে হচ্চে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হ'তে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়ে ও আমাদের কতক সাহায্য করতে পারে। কি বল বৌ-ঠান?

কিন্তু, বৌঠান জবাব দিবার পুর্ব্বেই গিরীশ খুসী হইয়া বলিলেন, ঠিক, ঠিক কথা বলেছ, হরিশ। কাঠবেরাল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধে ছিলেন যে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দেখেচ বড়বৌ, হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেছি কি না, ছেলেবেলা থেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারি প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যত ভেবে দেখ্‌তে পারে, এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট ক'রে ফেলেছিলাম। কা'ল থেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ ক'রে দিক। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট কর্‌বার দরকার নেই।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, টাকাটা কি তবে দেবে না, না কি?

নিশ্চয় না। তুমি বল কি, আবার না কি আমি টাকা দিই তাঁকে?

তবে। এমন কথা বলাই বা কেন?

হরিশ কহিলেন, বল্‌লেই যে দিতে হবে, তার কোন মানে নেই, বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই। সংসারের টাকা নষ্ট হ'লে আমারও ত গায়ে লাগে?

সেইটেই তোমার আসল কথা, ঠাকুরপো, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

৬

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেবা এম্‌নি নিরেট, এম্‌নি ভরাট যে, তাহার কোন এতটুকু ফাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁষিবার যো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশান্ত মন অনুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল, এ রহস্য জানিতেন শুধু অন্তর্য্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত হেলিয়া, টলিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত, দুর্ব্বল কণ্ঠে, বোধ করি বা সুমুখের দেয়ালটাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার জন বটে মেজ-বৌ, সে না থাক্‌লে আমাকে দেখ্‌ছি বেঘোরে মর্‌তে হ'ত। এমনি সেবা যত্ন আমার মায়ের পেটের বোন থাকলে কর্‌তে পার্‌ত না।

শৈল ঘরের ভিতরে রাঁধিতে ছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড় জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় সুরু করিলেন, আর পরকে খাওয়ানো পরানো শুধু অধর্ম্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কো কাজেই আসে না। আর এই আমার মেজ-বৌ। মুখের

কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ হাঁ ক'রে এসে পড়ে। আমি হেঁটে গেলে তার বুকে বাজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মানুষকেও আমি পরের ভাঙ্চি শুনে, পর মনে করেছিলুম।

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কানে আসিতেছে। এত কাছে উপস্থিত থাকিয়াও সে যখন এত বড় মিথ্যা অভিযোগে কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্য্যের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার চিঁ চিঁ কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত্তেই সবল ও সতেজ হইয়া উঠিল; বলিলেন, মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে, তা যে কারুকে দিয়ে একটুখানি পড়িয়ে শুন্‌ব, আমার সে জোটি পর্য্যন্ত নেই। পরকে খাওয়ান-পরান আমার কিসের জন্যে?

নীলা ছোট খুড়ীর কাছে বসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল; সেইখান হইতে কহিল, সে চিঠি যে মেজ-খুড়ীমা তোমাকে দু-তিনবার প'ড়ে শোনালেন মা! আবার কবে নতুন চিঠি এল?

তুই সব কথায় গিন্নীপনা কর্‌তে যাস্‌নে নীলা, বলিয়া মেয়েকে একটা ধমক দিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, চিঠি শুন্‌লেই হ'ল? তার জবাব দিতে হবে না? কেন তোর ছোট-খুড়ি কি মরেছে যে, আমি ও পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাব?

নীলাও রাগ করিয়া বলিল, চিঠি লেখবার কি আর কেউ নেই মা, যে আজ সংক্রান্তির দিনটায় তুমি খুড়িমাকে রিয়ে দিচ্ছ?

আজ সংক্রান্তি, সে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর স্মরণ ছিল না। তিনি

এক মুহূর্ত্তেই একেবারে পাংশু হইয়া বলিলেন, তুই যে অবাক্ করলি নীলা ? বালাই, ষাট ! মরবার কথা আমি তাকে আবার কখন্ বললুম না ? পেটের মেয়ে আমাকে মুখ নাড়া দেয় ! কা'ল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করলুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না ; এত যে রোগে ভুগচি, তবু ত আমার মরণ হয় না ! আজ থেকে আর যদি এক ফোঁটা ওষুধ খাই ত আমার অতি বড়—

কান্নায় সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল ! তিনি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে গিয়া একেবারে মড়ার মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন ।

নয়নতারা পাশের বারান্দায় জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল ; এখন ধীরে-ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল । আস্তে আস্তে বলিল, একখানা চিঠির জবাব দেবার জন্যে আবার তার খোসামোদ করতে যাওয়া কেন দিদি ? আমাকে হুকুম করলে ত দশখানা জবাব লিখে দিতে পারতুম ।

সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না ; পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইলেন ।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে এখনি কি সেটা লিখে দিতে হবে দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বড় মা মেজ-বৌ । বলচি, সে এখন থাক—সে তুমি পারবে না । তা

নয়নতারা রাগ করিল না। যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ-অভিমান প্রকাশ পাইত না। সে নীরবে উঠিয়া গেল।

বেলা দু'টা-আড়াইটার সময় সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে ডাকিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর খুড়িমা ভাত খেয়েছে রে?

নীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, খাবেন না কেন? রোজ যেমন খান, তেম্‌নিই ত খেয়েছেন।

সিদ্ধেশ্বরী হুঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শৈল চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী। সামান্য কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত, এবং তাই লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। হাতে ধরিয়া খোসামোদ করিয়া, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত। অথচ, সেই শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গঞ্জনাতেও কেন যে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার এই ব্যবহার তাঁহার কাছে যতই অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোন মতে একটা প্রকাশ্য কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন—কিন্তু তাহার ধার দিয়াও শৈল যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যায়। তাহার আচরণে বাড়ীর কেহ কিছুই দেখিতে পায় না; শুধু যিনি দশবছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ

করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্ত্ত-চিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন, শৈলর চারিপাশে একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহাকে শুধু ঝাপ্সা, দুর্নিরীক্ষ করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, মা, আমি যাই?

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়, শুনি?

নীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া, চেঁচাইয়া কহিলেন, কোথায় যেতে হবে শুনি? ছোটখুড়ির সঙ্গে তোর এত কি লা যে, একদণ্ড আমার কাছে বস্তে পারো না? বসে থাক্ হারামজাদী, চুপ করে এইখানে। কোথাও তোকে যেতে হবে না। বলিয়া নিজেই ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন।

নয়নতারা মৃদুপদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি মা, বড় হয়েচ, দু'দিন পরে শ্বশুরঘর করতে চ'লে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও, বাপ-মায়ের সেবা ক'রে নাও। মায়ের কাছে বস্বে, দাঁড়াবে; সঙ্গে সঙ্গে থেকে দু'টো ভাল কথা শিখে নেবে; এ সময়ে কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত? যাও, কাছে ব'সে দু'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন। রোগা শরীরে অনেকক্ষণ জেগে আছেন।

নীলা মেজখুড়ির প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মুখ তুলিয়া উত্তপ্ত-

কণ্ঠে কহিল, বাড়ীর মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজ খুড়িমা? তুমি কি খুড়িমার কথা বল্‌চ?

তাহার রুষ্ট আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, আমি কারো কথা বলিনি নীলা, আমি শুধু বল্‌চি, তোমার রোগা মায়ের সেবাযত্ন করা উচিত।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, সেবাযত্ন কর্‌বে। আমি ম'লেই বরঞ্চ ওরা বাঁচে।

নয়নতারা কহিল, ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোট বৌ ত ছেলেমানুষ নয়! তার ত বলা উচিত, যা নীলা, দু'মিনিট গিয়ে তোর মায়ের কাছে বোস্! না সে নিজে একবার আস্‌বে, না, মেয়েটাকে আস্‌তে দেবে।

নীলা কি একটা জবাব দিতে গিয়াও চাপিয়া গিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যি বল্‌চি, মেজবৌ, আমার এমন ইচ্ছে করে না যে, শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন সে দুটি চক্ষের বিষ হয়ে গেছে।

নয়নতারা কহিল, অমন কথা বোলো না দিদি। হাজার হোক্, সে সকলের ছোট। তুমি রাগ কর্‌লে তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ কথাটা ত মনে রাখ্‌তে হবে? ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচশ টাকা পেয়েছিলেন, তার খুচ্‌রো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী টাকা তোমাকে দিতে দিলেন; এই

নাও দিদি—বলিয়া নয়নতারা আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

উদাস-মুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নীলা, যা, তোর ছোটখুড়িমাকে ডেকে আন্, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।

নয়নতারার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করিয়া সে কল্পনায় যে সকল উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটী মাত্র ফুটিল না, তাহা নয়; এই টাকাটা তুলিবার জন্য অবশেষে সেই ছোটবৌকেই কি না ডাক পড়িল,—সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে! বস্তুতঃ, এই টাকাটা দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবার ইচ্ছাই ছিল না, শুধু নয়নতারা মস্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল্ চালিবার জন্যই স্বামীকে নিরন্তর খোঁচাইয়া-খোঁচাইয়া ইহা বাহির করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিস্পৃহ আচরণে এতগুলা টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোষে, ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। ছয়দিন পরে সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কি আমাকে ডাকছিলে?

শৈলর মুখের মাত্র এই দুটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর

কানের মধ্যে যেন অজস্র মধু ঢালিয়া দিল। তিনি চক্ষের পলকে বিগলিতচিত্তে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, হাঁ দিদি, ডাক্‌ছিলুম বৈ কি। অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বল্‌লুম, যা মা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে আন্‌, টাকাগুলো তুলে ফেলুক। এই নাও,—বলিয়া তিনি শৈলর প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন। আজ আর তাঁহার এমন ইচ্ছা হইল না যে, বলেন, এ কখন্‌ কাহার কাছে পাওয়া।

শৈল আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধীরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ্য হইয়া উঠিল। তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্য কোন মতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বল্‌লেন দিদি, 'জ্যাঠ্‌তুত-খুড়তুত ভাই নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই। তাঁর খাব না, পর্‌ব না ত আর পাব কোথায়? তবু, মাসে-মাসে এমনি পাঁচশ'-ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য কর্‌তে পারি ত অনেক উপকার!' কি বল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরীর হাসি মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বোধ করি, তাঁহার গাম্ভীর্য্যের হেতু অনুমান করিতে পারিল না। কহিল, শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন। তাই তিনি যখন তখন বলেন, বড় বো'ঠান মুখ ফুটে যেন কারো কাছে কিছু চান্‌ না; কিন্তু তাই ব'লে কি নিজেদের বিবেচনা

থাক্‌বে না ? যার যেমন শক্তি, কাজ কোরে তাঁকে সাহায্য করা ত চাই। নইলে ব'সে ব'সে শুধু গুষ্টিবর্গ মিলে খাবো, বেড়াবো, আর ঘুমোব, তা কর্‌লে কি চলে ? তোমারও ত হরি-মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই। আমাদের জন্যে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিলে তো তোমার চল্‌বে না। ঠিক কি না, সত্যি ক'রে বল দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তা সত্যি বই কি।

শৈল সিন্দুক বন্ধ করিয়া সুমুখে আসিয়া সেই চাবিটা তাহার রিং হইতে খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধীরভাবে কহিলেন, এটা কি হ'ল ছোটবৌ ?

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ক'দিন ধ'রেই ভেবে দেখ ছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে— মতিভ্রম হ'তে কতক্ষণ, কি বল মেজদি ?

নয়নতারা কহিল, আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবৌ, আমাকে মিছে কেন জড়াও ?

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুন্‌তে পাই কি ?

শৈল কহিল, একটা জিনিস হয়নি ব'লে যে কখনো হবে না, তার মানে নেই। এম্‌নি ত তোমাদের শুধু আমরা খাচ্ছি,

পরচি। না পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য কর্‌তে, না পারি গতর দিয়ে সাহায্য কর্‌তে। কিন্তু তাই ব'লে কি চিরকাল করা ভালো?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধ রোষে মুখ রাঙা করিয়া কহিলেন, এত ভাল কবে থেকে হলি লা? এত ভাল-মন্দর বিচার এতদিন তোদের ছিল কোথায়?

শৈল অবিচলিত স্বরে বলিল, কেন রাগ ক'রে শরীর খারাপ কর্‌চ দিদি? তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগ্‌চে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগ্‌চে না।

ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নয়নতারা তাঁহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির না হয় ভাল না লাগ্‌তে পারে, সে কথা মানি; কিন্তু, তোমার ভাল লাগ্‌চে না কেন ছোটবৌ?

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, ব'লে যা পোড়ারমুখী, কবে তুই বিদায় হবি—আমি হরির-নোট দেব। আমার সোণার সংসার ঝগড়া-বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে দিলি। মেজবৌ কি মিছে বলে যে, কোমরের জোর না থাক্‌লে মানুষের এত তেজ হয় না? কত টাকা আমার তুই চুরি করেচিস্, তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্নিকাণ্ডের মত মুহূর্ত্তকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু, পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন শাখার ন্যায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবৌ ; সে আমাকে এম্‌নি ক'রে অপমান ক'রে গেল ! কর্ত্তারা বাড়ী আসুন, ওকে আমি উঠানের মাঝখানে যদি না আজ জ্যান্ত পুঁতি ত আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী নয় !

৭

সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজিকার দৃঢ়নির্ভরতা কা'ল সামান্য কারণেই হয় ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু, দিনকয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যখন অন্যরূপ বুঝাইয়া দিল, তখন তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, কথাটা ঠিক যে, শৈলর হাতে টাকা আছে, এবং এই টাকার মূল যে কোথায়, তাহাও অনুমান করা তাঁহার কঠিন হইল না। তথাপি সে যে স্বামি-পুত্র লইয়া এই সহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোন মতেই থাকিতে সাহস করিবে না, ইহাও তিনি জানিতেন।

রাত্রে বড়কর্ত্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া, চোখে চস্‌মা আঁটিয়া, গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরি মোকদ্দমার দলিলপত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কাজ-কর্ম্ম ক'রে লাভটা কি, আমাকে বল্‌তে পারো ? কেবল শুয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মর্‌বে ?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কানে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্চি।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার কথা তোমাকে কে বল্‌চে! আমি বল্‌চি, ছোটবৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত কর্‌লে, সব মিছে হয়ে গেল, সে খবর শুনেচ কি?

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, হুঁ, শুনেছি বৈ কি। ছোট বৌমাকে বেশ ক'রে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে কে গেল—মণিকে—মোকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এই ভাবেই থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন—আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুল্‌তে নেই? আমি কি বল্‌চি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ। ছোটবৌরা যে বাড়ী থেকে চ'লে যাচ্চে।

ধমক খাইয়া গিরীশ চম্‌কাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চেন?

সিদ্ধেশ্বরী তেম্‌নি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্চে, তার আমি কি জানি?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে, অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, পোড়া কপাল! আমি নিতে যাব তাদের ঠিকানা লিখে! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট

না হবে ত তোমার হাতে পড়্‌বে কেন? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন? বলিতে-বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাপ-মা যে তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার উদ্বেগ ও মনস্তাপের আর অবধি রহিল না। কহিলেন, আজ যদি তুমি দু'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে খাবো, সে আমাকে কর্‌তেই হবে, তা বেশ জানি;—আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঁড়াবে, তার—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন এতক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে দুই চক্ষু ভাসাইয়া দিল।

জরুরী মোকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ, গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন—হরে?

হরি পাশের ঘরে পড়িতেছিল। শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।

গিরীশ প্রচণ্ড একটা ধমক্‌ দিয়া বলিলেন, ফের যদি তুই ঝগড়া কর্‌বি, ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙ্‌ব। হারামজাদার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আর ঝগড়া। মণি কই?

পিতার কাছে বকুনি খাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, জানিনে।

জান না? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে বটে?

আমার সব দিকে চোখ আছে, তা' জানিস্? কে তোদের পড়ায়? ডাক্ তাকে।

হরি অব্যক্ত কণ্ঠে কহিল, আমাদের থার্ড মাষ্টার ধীরেন বাবু সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, কেন সকালে? রাত্রে পড়ায় না কেন, শুনি? আমি চাইনে এমন মাষ্টার, কা'ল থেকে অন্য লোক পড়াবে। যা, মন দিয়ে পড়্‌গে যা, হারামজাদা, বজ্জাত।

হরি শুষ্ক, ম্লান মুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে-ধীরে প্রস্থান করিল।

গিরীশ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখেচ, আজকালকার মাষ্টারগুলোর স্বভাব? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে। রমেশকে ব'লে দিয়ো, কালই যেন এই পরাণ বাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাষ্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধূলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে!

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু একটা রোষ-কষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। এবং গিরীশ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিষটা সংসারে যে আবশ্যকীয় বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর যে জানা ছিল না, তাহা নয়; কিন্তু সে দিকে

এতদিন তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াছ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

আজই খাওয়া-দাওয়ার পর শৈল এ বাটী হইতে বিদায় লইবে, এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া একটা সুদীর্ঘ ক্রন্দন বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া জ্বরের ভান করিয়া বিছানাতেই পড়িয়াছিলেন, নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কি না, জিজ্ঞাসা করিল।

সিদ্ধেশ্বরী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন—না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুভব করিয়া ঠিক ঔষধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল—তাই আমি ভাবছিলুম দিদি, লোকে কি ক'রে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ার যদুবাবু, গোপালবাবু, হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্‌ঠাকুরের অর্দ্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাঙ্কে জমা নেই। তাদের পরিবারদের হাতেও দশ বিশ হাজারের কম নেই।

সিদ্ধেশ্বরী ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, কি ক'রে জান্‌লে মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, ইনি যে ব্যাঙ্কের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারা সব এঁর বন্ধু কি না। কা'ল গোপাল-

বাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রে বল্‌লে, এ কি একটা কথা মেজবৌ যে, তোমার দিদির হাতে টাকা নেই? যেমন ক'রে হোক—

সিদ্ধেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাক্স-পেঁটরা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসারের খরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি লুকোনো একটা পয়সা দেখ্‌তে পাও। যা করবে ছোটবৌ। আমার কি একটা কথা বল্‌বার জো ছিল? এমন সোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম, মেজবৌ, যে কখনো একটা পয়সার মুখ দেখ্‌তে পেলুম না। তেমনি শাস্তিও হয়েচে। এখন সে সর্ব্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্চে—কি করবে তার? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাক্‌লে সে টাকা ঘরেই থাকত, না, এমনি ক'রে জলে যেত, তা বল দেখি মেজবৌ?

মেজবৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, সে ত সত্যি কথা দিদি।

সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলর বিরুদ্ধে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, একটা লোক রোজগারী, আর এত বড় সংসার তাঁর মাথায় তাঁরই বা দোষ দিই কি ক'রে বল দেখি?

নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, সেত সবাই দেখ্‌তে পাচ্চে দিদি।

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা মৃদু-মৃদু বলিতে লাগিল, আমাদের গাঁয়ের নন্দ মিত্তির একজন ডাক্‌সাইটে কেরাণি। ছোট'ভাইকে মানুষ করতে, লেখা-পড়া শেখাতে,—তার ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে নিজের হাতে আর কাণা-কড়িটি রাখ্‌লে না। বড়বৌ বল্‌তে গেলে ধম্‌কে জবাব দিত—

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, ঠিক আমার দশা আর কি।

নয়নতারা কহিল—তা বই কি। বড়বৌকে নন্দ মিত্তির ধম্‌কে বল্‌ত, তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ ক'রে উকীল ক'রে দিলুম, বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেমনি দেখ্‌বে। মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান। কিন্তু এম্‌নি কলিকাল, দিদি, সেই নন্দ মিত্তিরের চোখে ছানি প'ড়ে যখন চাক্‌রিটি গেল, তখন নরেন উকীল—সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে সুদে আসলে পৈতৃক বাড়ীটার অংশ পর্য্যন্ত নীলাম ডেকে নিলে। এখন নন্দ মিত্তির ভিক্ষে ক'রে খায়, আর কেঁদে বলে, স্ত্রীর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত সে খুড়তুত-জাট্‌তুত নয়, মায়ের পেটের ভাই।

সিদ্ধেশ্বরী মনে-মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি মেজবৌ?

নয়নতারা বলিল, মিছে নয় দিদি, এ কথা দেশ শুদ্ধ লোক জানে।

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। তৎপূর্ব্বে তাঁহার এক

একবার মনে হইতেছিল, শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন ; এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ায় বিঘ্ন ঘটিতে পারে, মনে-মনে ইহাও নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু নন্দ মিস্ত্রির দুরবস্থার ইতিহাসে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিকল হইয়া গেল। শৈলকে বাধা দিবার আর তাঁহার চেষ্টামাত্র রহিল না।

গিরীশ তখন আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠি-উঠি করিতেছিলেন ; রমেশ আসিয়া কহিল, আমি দেশের বাড়ীতে গিয়েই থাক্‌ব মনে কর্‌চি।

কেন ?

রমেশ কহিল, কেউ বাস না কর্‌লে বাড়ী-ঘর দোরও ভেঙ্গে-চুরে যায়, আর জমি-জায়গা পুকুরগুলোও খারাপ হয়ে যায়। আমারও এখানে কোন কাজ নেই ; তাই বল্‌চি।

বেশ কথা! বেশ কথা! বলিয়া গিরীশ খুসি হইয়া সম্মতি দিলেন।

ছোট ভাইয়ের প্রার্থনার ভিতরে যে কত গৃহবিচ্ছেদ, কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল, সে সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না। তিনি আদালতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই শৈল বড়জায়ের ঘরের চৌকাঠের নিকট হইতে তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং সামান্য একটি তোরঙ্গমাত্র সঙ্গে লইয়া দুই ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিছানার উপর কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং নয়নতারা নিজের দোতালার ঘরের জানালা খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

গোটাদুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ীর কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত; কোন দিনই সুস্থ, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পাইতেন না; অথচ, শৈল কিংবা আর কেহ যে এই সকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এত বড় অসুখের সময়ও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ; তাহার জন্য এতটা স্থান চাই; ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েল ক্লথের ব্যবস্থা; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর এক প্রকার বন্দোবস্ত; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধা বোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত,—খেঁদির বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কি না, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কি না, এই সব দেখিতে দেখিতে, আর বকিতে বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত। আজ শোবার সময় বিছানার এতখানি যায়গা যে খালি পড়িয়া

থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁস ছিল না। নয়নতারার শতকোটী মাথার দিব্য দিবার পর তিনি রাত্রে নীচে হইতে খাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাঁহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দরজা দুইটা খোলা—সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে—বাকি বিছানাটা তপ্ত-মরুর মত শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেই দু'টি নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া তখন অজস্র তপ্ত অশ্রুতে তাঁহার মাথার বালিস ভিজিয়া যাইতে লাগিল। বাটীর ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁত্-খুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও এক বিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বদ্ধ সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলেরা নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া কম খায়; এবং এ ফাঁকি তিনি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাৎ কোন গতিকে কোন ছেলের খাওয়া চোখে দেখিতে না পাইলে তাহাকে জেরা করিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অনুভব করিয়া, নানা রকমে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন—সে কিছুতেই তাহার ন্যায্য আহার করে নাই; এবং এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে তখনই তাঁহার চোখের উপর

দাঁড়াইয়া একবাটি দুধ খাইতে হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে-মাঝে লড়াই করিত; জবরদস্তি খাওয়ানর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন—সে রোগা হইয়া যাইতেছে। এই লইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তির অবধি ছিল না। আজ বিছানায় শুইয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হয় ত কানাইয়ের খাইয়া পেট ভরে নাই, এবং পটল নিশ্চয়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় ত তাহাকে তুলিয়া খাওয়ানো হইবে না, হয় ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছট্‌-ফট্‌ করিবে;—কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে, দুঃখে, বেদনায় তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল! পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অনেক রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, মান্‌লুম যেন পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু, কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়;—তার ওপর তার জোর কি?

গিরীশ ঘুমের ঝোঁকে জবাব দিলেন, কিছু না।

সিদ্ধেশ্বরী আশান্বিতা হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, তা হ'লে আমরা নালিশ ক'রে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কি না, ঠিক বোলো?

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, নিশ্চয় শাস্তি হবে।

সিদ্ধেশ্বরী আশায়, আনন্দে, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, সে যেন হোলো; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমিই মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাক্‌তে পারে না, চাই কি ভেবে-ভেবে তার শক্ত অসুখ হ'তে পারে, তা'হলে হাকিম কি রায় দেবে না, যে, সে তার জ্যাঠাইমার কাছেই থাকুক? বেশ! অম্‌নি তোমার নাক ডাক্‌চে—আমার কথা বুঝি তবে শোন নি!—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপর সজোরে একটা নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন—নিশ্চয় না।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, কেন নয়? মা ব'লেই যে ছেলেকে মেরে ফেল্‌বে, মহারাণীর কিছু এমন হুকুম নেই? কালই যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকীলের চিঠি দিই, কি হয় তা হ'লে?—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকাধ্বনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাঁহার লেশমাত্র ঘুম আসিল না। কখন্‌ সকাল হইবে, কখন্‌ হরিশকে দিয়া উকীলের চিঠি পাঠাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরূপ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া কানাই ও পটলকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশকুসুমের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

প্রভাত হইতে-না-হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, উঠেচ ?

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, দেরী কর্‌লে চল্‌বে না, এখ্‌খুনি ছোট-ঠাকুরপোদের নামে উকীলের চিঠি লিখে দরওয়ান পাঠাতে হবে। তুমি বেশ ক'রে একখানা চিঠি লিখে ব'লে দাও যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব না পেলে নালিশ করা হবে।

হরিশকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করা বাহুল্য। সে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া, গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়-বৌ ? বোস, বোস—কি, কি নিয়ে গেছে ? দাবীটা একটু বেশি ক'রে দেওয়া চাই ? বুঝ্‌লে না ?

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন-গ্রহণ করিয়া, দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাঁহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিল, তুমি কি ক্ষেপেচ বড়বৌঠান ? আমি বলি বুঝি আর কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি কর্‌বে কি ?

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তোমার দাদা যে বল্‌লেন, নালিশ কর্‌লে তাদের সাজা হয়ে যাবে !

হরিশ কহিল, দাদা এমন কথা বল্‌তেই পারেন না। তোমাকে তামাসা করেচেন।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, এতটা বয়স হ'ল, তামাসা কাকে বলে—বুঝিনে ঠাকুরপো ? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয়

যে, ছেলে হু'টোকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট ক'রে বল না?

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, এ দাবী আদালত গ্রাহ্য করিবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া জব্দ করা যাইতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, তোমার উচিত তোমার থাক্, ঠাকুরপো; আমার তিন কাল গিয়ে এককাল ঠেকেচে; এখন মিথ্যে দাবী-দাওয়া করুতে পারুব না। পরকালে আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না। তুমি না লেখো, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেনবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনি গে। বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর সরকার গণেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন। সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, বারো গণ্ডা টাকার উপর আরও দু টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্ম্মে নূতন ব্রতী। তাঁহার নূতন ধারণা—তাঁহাকে নির্ব্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্ত্তীও যে চুরি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন,—পঞ্চাশ টাকা যে এক আঁজ্‌লা টাকা গণেশ! আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা

বেশি খরচ হয়েচে ব'লে এই পঞ্চাশ-পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে—আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা?

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, মা, দিদিকে ডেকে না হয়—

নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝ্‌তে হবে? সে আমার চেয়ে বেশি বুঝ্‌বে? না গণেশ, ও সব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমার যা ইচ্ছে তাই ক'রে হিসেব দেবে, সে হবে না বল্‌চি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। পোড়ার-মুখীকে দশ বছরের মেয়ে বৌ কোরে ঘরে আন্‌লুম। বুকে ক'রে মানুষ ক'রে এত বড় কর্‌লুম, এখন সে তেজ ক'রে বাড়ীর দু-দুটো ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তা যাক্। আমিও খবর রাখ্‌চি। কানাই পটলের কোন দিন এতটুকু অসুখ শুন্‌তে পেলে দেখ্‌ব, কেমন ক'রে সে ছেলে রাখে! তা এখন যাও—দুপুর বেলা মনে ক'রে ব'লে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি কর্‌লে।—বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, দিদি, বল্‌তে পারিনে কিন্তু, আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকা-কড়ি হিসাব পত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই ব'লে যে এত ঝঞ্ঝাট তুমি সহ্য কর্‌বে, আর আমি বসে-বসে দেখ্‌বো, সে ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি ক'রে হিসেবে গোল কর্‌বার জো নেই।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন,—সে ত ভাল কথা মেজবৌ। আমার

এই রোগা শরীরে এত হাঙ্গামা কি ভাল লাগে! শৈল ছিল, —যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, খরচ করা, ব্যাঙ্কে পাঠানো সমস্তই তার কাজ। এ সব কি আর আমাকে দিয়ে হয়? বেশ ত, এখন থেকে তুমিই কোরো মেজবৌ।—বলিয়া সিন্দুকের চাবিটা কিন্তু নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুর, অনেক খানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু এই একটা তাহার বড় রকমের গোড়ায়-গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফল-ভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না। সে শত্রুপক্ষকেও যেমন সন্দেহ করিতে শিখে, মিত্রপক্ষের উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়, সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে মুহূর্তে ছোটবৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হরাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।

## ৯

কোন একটা অভাব লইয়া—তা সে যত গুরুতরই হোক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তাঁহার শয্যার শূন্যতা, ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শৈলর ঘরের দিকটা তিনি মাড়াইতেই পারিতেন না, এখন

সে বারান্দা সচ্ছন্দে পার হইয়া যান—মনেও পড়ে না। কানাই পটলের সম্বাদ তিনি বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করিবার জন্য অহরহঃ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এখন সে উৎকণ্ঠার অর্দ্ধেক তিরোহিত হইয়া গেছে। এইরূপে সুখে-দুঃখে এক বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সে দিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কানে গেল যে, দেশের বিষয় লইয়া আজ ছয় মাস ধরিয়া ছোট দেবরের সহিত তাঁহাদের মামলা চলিতেছে। মোকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে। দেওয়ানী ত চলিতেছেই; গোটাদুই ফৌজদারীও ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে, ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার মত সম্বাদ জানার সুবিধা হইবে না জানিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় হরিশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, বল কি ঠাকুরপো, ছোট ঠাকুরপো করচে তোমার দাদার সঙ্গে মামলা?

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্য করিয়া কহিল, তাই ত হচ্চে, বৌঠান্!

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, আমার যে বিশ্বাস হয় না, মেজ-ঠাকুরপো। এখনো যে চন্দ্র-স্যিয্যি উঠ্‌চে!

নয়নতারা খাটের এক ধারে বসিয়া খোঁদিকে ঘুম পাড়াইতেছিল, মৃদুস্বরে কহিল, সে ত উঠ্‌চেই দিদি। আর এই ছোট-দেওরকেই তোমরা হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে সব ত তখন যায় নি, যাচ্চে এখন।

সিদ্ধেশ্বরী দুঃসহ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমা কেন ?

হরিশ বলিল, কেন ! দেখ্‌লুম, মোকদ্দমা না করে আর উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয় ! দেখ্‌লুম, আমরা গেলে আমাদের মণি-হরি-বিপিন-ক্ষুদে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না—দেশের বাড়ীতে হয় ত ঢুক্‌তে পর্য্যন্ত পাবে না। ধর না বড়বৌ, দেশে যা' কিছু আছে, সেই সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজানাপত্র আদায় করচে, খাচ্চে-দাচ্চে—একটা পয়সা পর্য্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা-কিছু তা ত দাদাই করেছেন, অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না,—এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমিও বাড়ী থেকে তাকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা তারাই বা ছেলেপিলে নিয়ে যাবে কোথায় ?

হরিশ বলিল, সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই, বড়-বৌ।

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদা কি বল্‌লেন ?

হরিশ বলিল, দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাব্‌না ছিল না বড়বৌ। যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয় নিয়ে গোল-যোগ বাধিয়েচে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলবার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা ফাঁসাতে হয়েচে।

নয়নতারা ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিল—আচ্ছা, ছোট-ঠাপকুরপোই যেন দোষী; কিন্তু, আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোট-বৌ কি করে এতে মত দিলে? আমরা আর সবাই দুষ্টু, বজ্জাত হতে পারি, কিন্তু সে তার বট্‌ঠাকুরকে ত চেনে। তাঁকে জেলে দিয়ে সে কি সুখ পেত?

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদ-মস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তথা হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারীতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিতেই তাহার অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা আজ তাঁহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ কখন্‌ জ্বর এল?

সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে বলিলেন, তবু ভালো, জিজ্ঞেসা করলে!

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! জিজ্ঞেসা করিনে ত কি? পশু ও ত মণিকে ডেকে বল্‌লুম, তোর মাকে ওষুধ-টষুধ দিস? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েচে সব এম্‌নি যে, বাপ-মাকে পর্য্যন্ত মানে না।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর বোলো না। পনর দিন হয়ে গেল, মণি তার পিসার ওখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে পশু জিজ্ঞেসা করলে! কখনো যা' করনি, তা কি আজ করবে?

তা' নয়, আমি সে জন্যে আসিনি। আমি এসেচি জান্‌তে, ব্যাপারটা কি? ছোট-ঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা কিসের?

গিরীশ মহা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন,—সেটা একটা চোর! চোর! একেবারে লক্ষীছাড়া হয়ে গেছে! বিষয়-পত্র সব নষ্ট করে ফেল্‌লে। সেটাকে দূর করে না দিলে দেখ্‌চি আর ভদ্রস্থ নেই—সমস্ত ছারখার-ধ্বংস করে দিলে।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, তা' যেন দিলে; কিন্তু, মাম্‌লা-মোকদ্দমা ত শুধু-শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই? ছোট-ঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায়?

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিল, দাদার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিল। সেই জবাব দিল—টাকার কথা ত এইমাত্র মেজবৌ বলে দিলে বড়-বৌঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার-চারেক নিয়েছিল, সেটা ত হাতে আছেই; তা' ছাড়া ছোটবৌমার হাতেই ত এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল—বুঝেই দেখ না!

গিরীশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে;—কিছু কি আর রেখেচে হে হরিশ! সেটা একেবারে বেহেড লক্ষীছাড়া হয়ে গেছে! শুক্রবার দিন কোর্টে এসে বলে—বাড়ী-ঘর-দোর মেরামত করতে হবে, পাঁচশ টাকা চাই!

হরিশ অবাক হইয়া গেল—বলেন কি? সাহস ত কম নয়!

গিরীশ কহিলেন,—সাহস বলে সাহস! একবারে লম্বা ফর্দ্দ—এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথাতে হবে; এটা না বদ্‌লালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। শুধু কি তাই? সংসারের অনাটন—শীতের কাপড়-চোপড় কিন্‌তে হবে,—ধান কিনে, আলু কিনে রাখ্‌তে হবে—এমনি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিনশ টাকার দরকার।

হরিশ অসহ্য ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল—নির্লজ্জ! তার পরে?

গিরীশ বলিলেন, ঠিক তাই! হতভাগার একেবারে লজ্জা-সরম নেই—এক্কেবারে নেই। এই আটশ' টাকা নিয়ে তবে ছাড়্‌লে।

নিয়ে গেল? আপনি দিলেন?

গিরীশ বলিলেন, না হলে কি ছাড়ে? নিয়ে তবে উঠ্‌ল যে!

হরিশের সমস্ত মুখখানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছায়ের মত হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, তা'হতে মাম্‌লা মোকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা?

গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, কিছু না, কিছু না। নিজের সংসারটা যে চালিয়ে নেবে, হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই—এম্‌নি অপদার্থ হয়ে গেছে। শুনি, বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসিয়ে দিনরাত তাস-পাশা চল্‌চে, আর খাচ্চেন—বাস্‌! মানুষ যেমন শিব স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েচে তাই—

বুঝ্‌লে না হরিশ। বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হো হো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন।

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিতে বলিতে গেল, আচ্ছা, আমি একাই দেখ্‌চি।

মাঘ মাসের বাইশে মোকদ্দমার দিন ছিল। বিশে গিরীশের এক জ্ঞাতি-কন্যার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরীশকে চাপিয়া ধরিলেন, দাদা তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও, এই আমার বড় সাধ। তোমাকে একটি দিনের জন্যেও অন্ততঃ দেশে যেতে হবে।

'না' শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, যাব বই কি ভায়া, নিশ্চয় যাব।

কন্যার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই 'নিশ্চয়' কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হইবে, তার সব চেয়ে বেশি জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী। সুতরাং প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত হইয়াছিলেন, স্ত্রী হন নাই।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, বল কি! আজ যে আমার সেই জয়পুরের মক—

না, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। উকিল হয়ে পর্যান্তই ত মিছে কথা বলে আস্‌চ—আজ একটা কথাও রাখো। পরকালের ভয় কি তোমার এতটুকু হয় না?

গিরীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, পরকাল? তা বটে—কিন্তু—

না, কিন্তুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও।

অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।

যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, ছেলে দুটোকে—বলিয়াই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, বলিয়া গিরীশ বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি হবে, তাহা স্বামি-স্ত্রীর কেহই বুঝিল না। নয়নতারা গা টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল, ও-বাড়ীতে কিছু খেতেটেতে বট্‌ঠাকুরকে মানা করে দিলে না কেন?

সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, বলা যায় কি দিদি।

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়ে তখনও জল পড়িতেছিল। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, সে তুমি পার মেজবৌ। শৈলর গলা কেটে ফেল্‌লেও সে তা পারবে না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মোকদ্দমার তদ্‌বির করিতে দুই একদিন পূর্ব্বে জেলায় যাইবার জন্য রমেশ ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। শৈল সেখানে ছিল না। সে ঠাকুরঘরের মধ্যে দেহ হইতে তাহার সর্ব্বশেষ অলঙ্কারখানি খুলিয়া ফেলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র, যুক্ত-করে মনে-মনে বলিতেছিল, ঠাকুর আর ত কিছু নাই; এইবার

যেমন করিয়া হোক্ আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার ছেলেরা না খাইয়া মরিতেছে, আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কাল-সার হইতেছেন—

ওরে কেনো—ওরে পটলি—

শৈল চমকিয়া উঠিল,—এ যে তাহার ভাশুরের কণ্ঠস্বর! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনিই বটে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত, স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি! চিরকাল যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক তাই। কোথাও কোন অঙ্গে যেন এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কানাই পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল; পটল খেলা ছাড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।

রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

গিরীশ কহিলেন, এমন সময় কোথায় যাওয়া হবে?

রমেশ কুণ্ঠিত অস্পষ্ট স্বরে বলিল, জেলায়—

গিরীশ চক্ষের পলকে বারুদের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, —হাতভাগা, লক্ষীছাড়া, তুমি আমার খাবে-পরবে, আর আমারই সঙ্গে মামলা করবে? তোমাকে এক সিকিপয়সার বিষয়-আশয় দেব না,—দূর হও আমার বাড়ী থেকে; এক্ষণি দূর হও—এক মিনিট দেরী নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—

রমেশ কথা কহিল না, মুখ তুলিল না; যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। দাদাকে সে যেমন ভক্তি-মান্য করিত,

তেমনি চিনিত। এই সব তিরস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া সে তখনকার মত মুখ বুজিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন শৈল আসিয়া দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

গিরীশ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এস, এস, মা এস। সে স্বরে, উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই—বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া কোন লোকের সাধ্য নাই যে, বলে এই মানুষটাই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে ওরূপভাবে চীৎকার করিতেছিল।

গিরীশের নজরে কোন দিন কিছু পড়ে না; কিন্তু আজ কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করিল। শৈলর প্রতি চাহিয়া বলিলেন; তোমার গায়ে গয়না দেখ্ছিনে কেন ছোট বৌমা?

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

গিরীশের কণ্ঠস্বর পুনরায় এক-এক-পর্দ্দা চড়িতে লাগিল—ঐ হতভাগা শূয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কার? আমার! ওকে আমি জেলে দিয়ে তবে ছাড়্ব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * * * *

বাইশে মোকদ্দমার দিন অপরাহ্ণ-বেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিল; এবং ধড়া-চূড়া না ছাড়িয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নয়নতারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল;

খবর পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যে পাশ ফিরিয়া নীরব হইয়া রহিল, কেহই তাহার মুখ হইতে একটা জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মোকদ্দমায় যে হার হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই,—দুই জা'য়ে নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন,—মোকদ্দমায় হার-জিত আছেই,—তা'ছাড়া, এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে—এরই মধ্যে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই দু'টি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল, নিজে উকীল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না।

সিদ্ধেশ্বরী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মেজ-ঠাকুরপো, আমি বলচি, তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোর্ট কর। আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তুমি জিতবেই।

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোঠান, সে হবার জো নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল—কোথাও কোন রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল;—বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি সর্ব্বস্ব ছোট-বৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেছেন; রেজেষ্ট্রি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর পথ নেই।

দুই জায়ে মুখোমুখি [illegible] পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকি রাখিল না।

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন, যে, এ ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা, নচ্ছার, বোম্বেটে ছোট-বৌমার গয়নাগুলো বেচিয়া খাইয়াছে, আর একটু হইলেই বাড়ীর ইটকাঠ পর্য্যন্ত বেচিয়া খাইত—দেশের বাড়ীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে মুখুয্যে-বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেশ্বরী একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, ভাল মন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে, তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখ দু'টিতে জল তখনও টল্ টল্ করিতেছিল;—দুই পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে, যার যা মুখে এলো—বলে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাঁদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে কথা আজ যেমন আমি বুঝেচি এমন কোন দিন নয়!

গিরীশ মহা খুসী হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিতে